সোনাভান : জনপ্রিয়তার উৎস সন্ধানে

তপন দত্ত

সোনাভান বা সোনাভান পুথি আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে রচিত একটি তথাকথিত মুসলমানি বাংলা বই। রচয়িতা ফকির গরীবুল্লাহ। রচনা শেষে গরীবুল্লাহ লিখেছেন : ''এগারশ সাতাইশ সালের মাঘ মাসে/সোমবারের বাদ আছর ফকিরেতে ভাসে।।/খতম হইল পুথি আর কিছু নাই।''—আজকের আধুনিক পাঠকের কাছে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই সোনাভানের পুথি তেমন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-সম্ভার বলে মনে না হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু উনিশ শতকে এই বই চরম জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বইটির এই জনপ্রিয়তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এর সঙ্গে উনিশ শতকে বাঙালি সমাজ-ইতিহাসের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। এদিকে সোনাভান এর নাম আমরা ক'জন জানি!

শুধু উনিশ শতকে নয়, আজকের এই সময়ে যখন হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদকে 'ইস্যু' করে 'রাজনীতি' করা হয়, তখন আমরা শিক্ষিত প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ মানুষজন বা কতটুকু চিনি কাছের পড়শিকে? কতটুকু খবর রাখি তাদের দেশজ-লোকজ শেকড়-বাকড়ের? এর উত্তর এককথায় দাঁড়ায়; না, আমাদের প্রায় কিছুরই খবর রাখা হয় না। এই পরস্পর পরস্পরকে না-চেনার জায়গা থেকে শুরু হয় বিভেদ বা বিদ্বেষের আখ্যান। আর এর শুরুটা আজকের নয়, অনেক আগেই তার সূত্রপাত হয়েছিল সাগরপারের সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কূটনৈতিক বাসনায়। আমরা একটু ইতিহাসের পাতা ওল্টাই। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে পলাশির যুদ্ধের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটে। বাংলার রাজধানীও কয়েক বছরের মধ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ১৭৯৩ এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন বনেদি হিন্দু জমিদারদের পাশাপাশি মুসলমান জমিদারদেরও অনেকে জমিদারি হারিয়ে অতি সাধারণ মানুষে পরিণত হয়। তারপর মড়ার ওপর খাড়ার ঘা—১৮৩৭ এ রাজভাষা থেকে ফারসির অপসারণ। এই সবকিছুর সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় এককালের শাসকশ্রেণি নিঃস্ব, রিক্ত, নিরক্ষর, নিষ্ক্রিয়, নির্জীব এক জাতিতে পরিণত হল। এই পরিস্থিতিতে অবস্থা আরও মারাত্মক হয় মুসলমানদের মূঢ়-স্বাভিমানের কারণে। যার দরুন ইংরেজ শাসকের যাবতীয় সংস্পর্শ, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেদের সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখে এদেশীয় মুসলমানেরা। ব্যক্তিগতক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে তেমন কোনো নেতিবাচক

ধারণা ছিল না তৎকালীন মুসলমান সমাজের। এমন সিদ্ধান্তের সপক্ষে প্রামাণ্য তথ্য রয়েছে মীর মশাররফ হোসেনের আত্মকথায়। ব্যক্তিগতভাবে মশাররফ সেই শৈশবেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন এবং তাঁর সে আগ্রহ পূরণের পথে কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়নি পরিবারের পক্ষ থেকে। তবু বৃহত্তর সমাজ ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়েই থাকল। অন্যদিকে বর্ণহিন্দু বাঙালি পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির হাত ধরে নিজেদের আখের গোছাল, পরিচিত হল দেশাত্মবোধ নামক বোধের সঙ্গে। তবে এদিনের এই দেশাত্ববোধের মধ্যে ছিল অনেক সীমাবদ্ধতা। আজকে আমরা যাকে বলি হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল এই দেশাত্ববোধ। আর এরই প্রতিক্রিয়ায় অভিমানাহত প্রতিবেশী মুসলমান সমাজও ধর্মের নামে আঁকড়ে ধরেছিল এক ধরনের সংকীর্ণ জাতীয়তাকে। বিষয়টি জেমস্ লঙ তাঁর একটি চিঠিতে এইভাবে উল্লেখ করেছেন : The Musalmans have always been noted for the tenacity with which they have clung to their own ideas and language, and for the obstinacy with which they have resisted foreign influence.

জাতীয়তাবোধের প্রশ্নে এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের আকাশে ঘনীভূত হয় সাম্প্রদায়িকতার কালো মেঘ। বাংলা সাহিত্য ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে আলাদা আলাদা ভাবে হিন্দুর এবং মুসলমানের। অথচ সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে বাংলা সাহিত্য সাধনায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ভাব প্রাধান্য পেয়েছিল। আরাকান রাজসভার সাহিত্যচর্চায়, নসির মামুদদের পদাবলিতে কিংবা মুসলমান রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরনো কাব্যের অনুবাদকর্মে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উচ্চকিত উচ্চারণ রয়েছে। পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয় উত্তর পলাশির যুদ্ধ পর্ব থেকে। উনিশ শতকের সূচনায় বাঙালি হিন্দু পণ্ডিতেরা বাংলাভাষা থেকে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দকে বের করে দিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে শুরু করলেন আভিধানিক এবং তৎমস শব্দ সহযোগে। বাঙালি মুসলমানদের মনে হল বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মুখ চেয়ে এটা করা হচ্ছে। হিন্দু লেখকদের তৎসম ও আভিধানিক শব্দ কণ্টকিত বাংলা সাহিত্যে প্রতিবেশী মুসলমান নিজেকে খুঁজে পেতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন। বাধ্য হয়ে তখন তারা ধর্মগৌরব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য আরবি-ফারসি-উর্দু সাহিত্যের দিকে হাত বাড়ালেন। আরবি-ফারসি উৎস থেকে সাহায্য নিয়ে মুসলমান কবি বা লেখকেরা উনিশ শতকের আগেও সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু উনিশ শতকের বিশেষ প্রেক্ষাপটে বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রচিত হতে লাগল আরবি-ফারসি-উর্দু প্রধান বাংলা সাহিত্য। এতে যেমন ইংরেজি শব্দের প্রবেশ নিষেধ তেমনি সমানভাবে বর্জিত হল হিন্দুয়ানির স্পর্শযুক্ত তৎসম শব্দ। এইভাবে উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের ধর্ম জিজ্ঞাসা ও গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করার জন্য রচিত হতে লাগল একের পর এক বই। বইগুলি সাধারণ মুসলমান পাঠক বা শ্রোতাদের কাছে পরিচিত ছিল পুথি নামে। এই বই সম্পর্কে উনিশ শতকের শিক্ষিত হিন্দু বা ব্রাহ্মরা সেভাবে আগ্রহী হননি; বরং অবজ্ঞার চোখে দেখতেন মুসলমানি বাংলায়

রচিত এইসব রচনাকে। কিন্তু আজকের তথ্যনিষ্ঠ গবেষক এই মুসলমানি বাংলা বইগুলিকে সামনে রেখে বুঝে নিতে পারেন উনিশ শতকের সমাজ-ইতিহাসের নানা দিককে।

মুসলমানি বাংলা বই বিভিন্ন বিষয়ে লেখা হয়েছে যেমন- ধর্মসংক্রান্ত, গল্পকাহিনি বা কেচ্ছাকাহিনি, নীতিকথামূলক, চিকিৎসাবিষয়ক, জীবনীমূলক, জ্যোতিষবিষয়ক, আইন সম্বন্ধীয় এবং গানের। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারাটি হল কেচ্ছাকাহিনিমূলক। এই মুসলমানি কেচ্ছাগুলির বেশিরভাগই প্রেমকাহিনি, তার সঙ্গে মিশে থাকে যুদ্ধবিগ্রহ, শক্তিপরীক্ষা, নারীপুরুষের লড়াই ইত্যাদি। এরকম কয়েকটি (মুসলমান) কেচ্ছাকাহিনি হল আজিজর রহমানের 'গোলে হরমুজ বাহারিয়া' , মহাম্মদ দানিসের 'গুলবা সানুবর', মহাম্মদ আজহার হোসেনের 'তামিম গুলাল চৈতন সিলাল'। 'বসিরউদ্দিনের 'গোলে সাহানুর', মনিরুদ্দিনের 'চামনে নও বাহার', রমজান আলির 'ভানুবতী', হাবিল এর 'সমরিতাভানের পুথি প্রথম ভাগ' ইত্যাদি। এই বইগুলির মধ্যে সোনাভানের পুথি উনিশ শতকে অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা পায়। মুদ্রিত সোনাভানের পুথির প্রথম উল্লেখ পাই ২৪.৬.১৮৫২ তারিখে 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায়' চিঠির আকারে প্রকাশিত 'মুসলমান বেঙ্গলি লিটারেচার' শিরোনামে। ১৮৫৫ তে জেমস্ লঙ কৃত ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটির লাইব্রেরি ক্যাটালগে সোনাভান পুথির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৫৯ এ প্রকাশিত লঙের 'পাবলিকেশনস্ ইন দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ১৮৫৭' নামক ক্যাটালগেও সোনাভানের উল্লেখ আছে। লঙের ১৮৬৭ তে করা 'ডিস্ক্রিপটিভ ক্যাটালগ অফ ভার্নাকুলার বুকস্ এন্ড প্যামফ্লিটস্' তেও সোনাভানের কেচ্ছা নথিবদ্ধ আছে। 'মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য' শিরোনামে ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকি নবম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই রচনায় মুসলমানি বাংলা বইয়ের তালিকায় সোনাভান আছে। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ক্যাটালগ, যা সংকলন করেছিলেন ব্লুমহার্ড, সেখানেও সোনাভানের পুথির উল্লেখ আছে। লেখকের নাম ফকির মহম্মদ। প্রথম প্রকাশ ১৮৬৭। সেখান থেকে আরও জানা যায়, ১৮৬৭-৭৮ এর মধ্যে কলকাতায় বইটি দশবার ছাপা হয়। ১৮৭৪ এ বইটি কয়থি নাগরিতেও ছাপা হয়। ছাপা হয় সিলেট নাগরীতেও। সোনাভানের রচয়িতা হিসাবে একাধিক লেখকের নাম পাওয়া যায়। যেমন- আব্দুল কাশিম, জালাল ফকির, অধীন ফকির ইত্যাদি। বেণিমাধব ভট্টাচার্য নামে একজন হিন্দু লেখকেরও নাম পাওয়া যায়। ১৮৭৪ এ বেণিমাধব ভট্টাচার্যের সোনাভান ছাপা হয়েছিল ৪০০০। একটা আকর্ষণীয় তথ্য এখানে পেশ না করলেই নয়; তা হল সোনাভানের পুথির বেশির ভাগ প্রকাশক ছিলেন হিন্দু । যেমন- বানেশ্বর ঘোষ, বিশ্বম্ভর লাহা, কৃষ্ণলাল চন্দ্র, অক্ষয়কুমার রায় এন্ড সন, ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, রসিকলাল গুপ্ত , রামচন্দ্র মিত্র, নৃসিংহ কুমার ঘোষ, কানাইলাল ধর, হৃদয়লাল শীল, রামকানাই দাস প্রমুখ। দুজন মুসলিম প্রকাশকেরও নাম পাওয়া যায়। তাজউদ্দিন মহম্মদ ও মনিরুদ্দিন আহমদ। এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না বইটির বহু সংস্করণ হয়েছিল এবং মুদ্রণ সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। বিশ্বম্ভর লাহা নামের এক প্রকাশকের কয়েক বছরের মুদ্রণ সংখ্যার খতিয়ান আমরা তুলে ধরতে পারি :

১৮৭৪—৩০০০, ১৮৭৫—৩০০০, ১৮৭৬—৩০০০, ১৮৭৭—৩০০০, ১৮৭৮—৬০০০, ১৮৭৯—৬০০০, ১৮৮৩—২০০০,১৮৮৫—২৫০০। বইটির আর এক প্রকাশক অক্ষয়কুমার রায় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বইটির দশম সংস্করণ ছেপেছিলেন। এই বই এখনও ছাপা হয়; একেবারে নিশ্চহ্ন হয়ে যায়নি এটি।

উনিশ শতকে সোনাভানের পুথি জনপ্রিয় হওয়ার নেপথ্য কারণ নিছক আখ্যান বা গল্পরস নয়, সমাজ ইতিহাসের গভীরেই নিহিত রয়েছে এর মূল। আমরা আগেই বলেছি, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির হাত ধরে শিক্ষিত বর্ণহিন্দু বাঙালির মধ্যে জেগে ওঠে একধরনের জাতীয়তাবোধ, যাকে আজ আমরা হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ বলে চিহ্নিত করে থাকি। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসুরা এই ভাবধারার দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের গৌরব মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য মোঘল পাঠানদের হীনবীর্য করে মারাঠী রাজপুতদের বীরপুরুষ ও আদর্শ নেতা হিসাবে চিত্রিত করতে থাকেন। সেদিনের তরুণ রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী উৎসব' (১৩১১) কবিতা রচনা করে শিবাজীর মহত্ত্ব তুলে ধরেন এবং ভারতে এক ধর্মরাজ্য গঠনের স্বপ্নের কথা প্রচার করেন। এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে যখন এরই বর্ণময় উচ্চারণ ধ্বনিত হয় তখন মুসলমান সমাজ বিষয়টিকে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেনি। এর উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়ার বাসনায় উদগ্রীব হয় তারা। আর তারই ফলশ্রুতি সোনাভানের মতো কাব্যসমূহের জনপ্রিয়তা। সোনাভানের অ্যাখ্যানে রয়েছে সোনাভান নামি হিন্দু রাজকন্যার সঙ্গে মুসলমান বীর যুবা হানিফার প্রেম ও বিবাহ বৃত্তান্ত। রমজান আলির 'ভানুবতী' (১৮৮২) বইতেও হিন্দু রাজকুমারী ভানুবতীর সঙ্গে আলির বিবাহের কথা আছে। হাবিল এর সামরিতাভানের পুথিতেও হিন্দুরাজকন্যা সামরিতাভানের সঙ্গে হানিফার বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। মনহওয়ার আলির এলমাস রায়হান এর কাহিনিতেও দেখানো হয়েছে কীভাবে এক মুসলমান রাজপুত এলমাস দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যা গোলে রায়হানের প্রেমে পড়ে এবং যুদ্ধে ইন্দ্রকে হারিয়ে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে। গাজির পুথি, গাজিকালু ও চম্পাবতী কন্যার পুথির মধ্যেও হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলমানের বিয়ে দেখানো হয়েছে। এটা যে উনিশ শতকের হিন্দু লেখকদের কাহিনিতে মুসলমান রমণীকে হিন্দু যুবকের প্রেমাসক্ত হিসাবে চিত্রিত করার একটা প্রতিক্রিয়া তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

'সোনাভান'-এ হিন্দু রাজকন্যা শুধু মুসলমান বীরপুরুষকে বিবাহ করেছে তাই নয়, এই অ্যাখ্যানে 'নাদান আওরাত' সোনাভানকে শেষপর্যন্ত পর্যুদস্ত করে হানিফার দাসত্ব স্বীকার করানো হয়েছে। সোনাভান তার হবু সপত্নীদের উদ্দেশ্যে জানায় : ''কলেমা পড়িয়া আমি দাসী হইয়া রইব।/তোর সাথে আমি মোদিনাতে যাব।।" যে নারী এইভাবে আখ্যান শেষে আত্মসমর্পণ করে, ধনে মানে শারীরিক বলে সেই নারী কিন্তু সামান্য নয়। টুঙ্গির শহরের সে শাসনকর্ত্রী, অঢেল তার ধনসম্পদ 'কুয়েতের হদ্দ আল্লাএ দিয়াছে তাহারে'। স্বামী নির্বাচনে ক্ষেত্রে তার প্রতিজ্ঞা ছিল : ''জোরেতে জেয়াদ জেবা পাছরিবে মরে।/সে হবে সোয়ামি মর ভজিব তাহারে।।" 'হজরত আলির বেটা রছুলের নাতি' হানিফা তার পাণিপ্রার্থী হলে সে সেই প্রস্তাব ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। মধ্যস্থতাকারী বুড়িকেও উত্তম মধ্যম দেয়।

হানিফাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজেকে সোনাভান সাজায় রণরঙ্গিনী রূপে : ''দুধে চাউলে ত্রিসমোন করিল জলপান।/আশি মোন খানা ফের যাত্র সোনাভান ।।/আশিমোন লোহার গুর্জ তুলি লইল হাতে।/আছিল লোহার জেরা পোরিল গাএতে।।../আছিল লোহার টোপ তুলি দিল শিরে।/নেজা গুর্জ তলো ঢাল পিঠ পরে।।/রাহাতে চলিল দণ্ড করে করমর/ এমন জোরেতে চলে যেন চলে জেন ঝর।।''

প্রথম যুদ্ধে হানিফাকে পর্যুদস্ত করে তাকে প্রাণে মারল না সোনাভান, ছুঁড়ে ফেলে দিল মদিনা শহরে। হানিফা হাল ছাড়ে না, সোনাভানকে যে কোনো মূল্যে পেতে চায় সে। তাই দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হয় সোনাভান ও হানিফা। এবারে জেতার মুখে এসে হানিফা হেরে যায় বিশেষ কারণে। কোনোক্রমে প্রাণ রক্ষা হয় তার। তবু হাল ছাড়ে না সে। আবারও মুখোমুখি হয় সোনাভানের এবং পর্যুদস্ত হয় চূড়ান্ত রূপে। অবশ্য এরপরেও লড়াই থেকে পিছু হটে না হানিফা। কারণ সোনাভানকে তার চাইই। এবার হানিফার হয়ে আসরে নামে হানিফার পত্নী ত্রয়– মলিকা, জৈগুন ও সমর্তভান। শেষপর্যন্ত সমর্তভানের কাছে পরাস্ত হতে হয় সোনাভানকে।

হানিফা এবং সোনাভানের এই দৈহিক শক্তিপরীক্ষায় জয়–পরাজয় নির্ধারণে ধর্মের প্রতি যোদ্ধাদের মনোভাব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ধর্মীয় এই বিষয়টিকে নিছক একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার বলে আমরা মনে করি না। উনিশ শতকের বিশেষ সন্ধিক্ষণে সবদিক দিয়ে কোণঠাসা বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের উজ্জীবনের অবলম্বন হিসাবে ধর্মকে–ধর্মসংস্কারকে বিশেষভাবে আঁকড়ে ধরে বলে আমরা জানি। প্রচলিত ইসলামধর্মের সংস্কারকে অঙ্গীকার করে স্বজাতীয়দের উজ্জীবিত করার জন্য জোরদার সওয়াল করেছেন ইবনে মায়ুদ্দিন আহমেদ ওরফে মহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন। তাঁর আত্মজীবনী মূলক রচনা 'আমার সংসার জীবন ' এ (১৯১৫) দেখা যায় সোনাভানের আখ্যানের ধর্মীয় প্রসঙ্গ উনিশ শতকীয় বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে উজ্জীবনের আয়ুধ হিসাবেই কাজ করেছে। আখ্যান শুরুই হয়েছে আল্লা বন্দনা দিয়ে : আল্লা ২ বল ভাই নবি কর সার/নবির কলেমা পড়ি হইয়া জাবে পার।।'' কাব্যকাহিনি শেষও হয়েছে আল্লার নাম করে : আল্লা আল্লা বল ভাই সব মোমিন গণ।/শোন হানিফার জঙ্গ হইল খতম।।'' হানিফার পরিচয় প্রসঙ্গে রচয়িতা জানাতে ভোলেন না; 'আল্লার মেহের আছে হানিফার উপর'। তাই 'কেহ না আটিতে পারে দুনিয়া ভিতর।' সোনাভান তার আপন ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠাবতী। কিন্তু সে আল্লা ভজে না। তাই তার উপর আল্লা 'বেজার'। আল্লাহ তাই তার মদতপুষ্ট হানিফাকে স্বপ্নাদেশ দেয় সোনাভানকে উচিত শিক্ষা দিতে। এই স্বপ্নাদেশকে বলা যেতে পারে এই অ্যাখ্যানের প্রস্তাবনাসূত্র। এরপরেই গল্প তার লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে যায়। দুর্গম গন্তব্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে হানিফা আল্লার কৃপা প্রার্থনা করে :''আল্লা বিনে নাই গতি সেইত সঙ্গের সাথি/প্রভু বিনে নাই মর গতি।..../দয়া যদি কর ভারি তবেত জাইতে পারি/নহে কিবা যোগ্যতা আমার।।'' কিন্তু মানুষ মাত্রেই কোনো না কোনোভাবে 'ভুল' করে। তাই দেখি দ্বিতীয়বারের দৈহিক শক্তি পরীক্ষায় সোনাভানকে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ায় হানিফা নিজের অহং-কে

প্রকাশ করে বলে : 'আমি জে লড়াই করি জোরেতে আমার'। সেখানে সোনাভানের স্বীকারোক্তি : ''শিব আর জএকালি আছে মর ঘরে।।/তার জোরে লড়ি আমি কারে করি ভএ।" 'প্রত্যাশিতভাবে' আল্লা ক্ষুদ্ধ হন হানিফার উপর : ''আপনার জোরে মর্দ্দ করেন লড়াই।/উচিত মতন তারে করিব সাজাই।।" আর এর পরেই হানিফা সোনাভানের হাতে চরমভাবে নাকাল হয়। মৃত্যু আসন্ন মুহূর্তে হানিফা শেষবারের মতো আল্লাকে ডাকে। আর তাতেই বেঁচে যায় সে । এরপর আল্লা উদ্যোগী হন হানিফার প্রার্থনা পূরণ করতে আর তখন হানিফাও অকপটে স্বীকার করে আল্লার মহিমা: আল্লার মেহেরে বাঁচি আমি আছি তাই।

তৃতীয়বারের শক্তি পরীক্ষায় হানিফা অহংপ্রকাশের পরিবর্তে আল্লার স্মরণ নিল। তাই সোনাভান যখন হানিফাকে সিন্দুকে পুরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল তখনও হানিফার মরণ হয় না। পীরের দয়ায় সিন্দুক-বন্দী হানিফা আশ্রয় পেল পীরের কোলে আর 'সিন্দুকে থাকিয়া হানিফা আল্লাহ বলে'। পীর ভরসা জাগিয়ে জানায় : ''আল্লার রহম আছে তোমার উপর।/ দরিয়াতে না মরিবে শোন সে খবর।।" চতুর্থবার, অর্থাৎ শেষবারের প্রচেষ্টায় সোনাভান যে পর্যুদস্ত হবে, তা ফতেমার কথায় আগাম জানা যায়: আল্লা চাহে এইবার হইবে যে ফতে' । সমর্তভানের মধ্যেও ক্ষণিকের জন্য অহংকার প্রকাশ পেলে তার ভুল ধরিয়ে দেয় বিবি জৈগুন;তখন নিজেকে সংশোধন করে আল্লার কাছে প্রার্থনা করে : এলাহি আলামিন আল্লা হয় মেহেরবান।/হানিফাকে দিয়ে মদের রাখহ পরান।।"

আল্লা তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করে। আর এইভাবে রচয়িতা তাঁর আখ্যানে আল্লার হাতকে প্রসারিত করেছেন অতি প্রত্যক্ষতায়। আখ্যানের এই ধর্মীয় প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় চোখে না পড়ে পারে না, তা হল হিন্দু দেবদেবীর তুলনায় মুসলমান মহাপুরুষদের ক্ষমতাবান হিসাবে চিত্রিত করা। দ্বিতীয়বারের শক্তি পরীক্ষায় হানিফা পর্যুদস্ত হয় সোনাভানের কাছে। সোনাভান বলি দিতে চায় হানিফাকে। কিন্তু তাকে যে কাজ থেকে বিরত করে শিব বরং বলে হানিফাকে যত্নআত্তি করতে :''শিব বলে সোনাভান শোন শিঘ্র গতি।/ হজরত আলির বেটা রসুলের নাতি।।/এহারে খাইতে দেয় জাহা খাইতে চাএ।/ মনে হইলে জার নাম কাপে থরথরে।।"—এইভাবে মুসলমান বীরের হাতে হিন্দু দেবদেবীর পরাজয় বা বশ্যতা স্বীকারকে তুলে ধরা হয়েছে সোনাভানের আখ্যানে। পরাধীন হৃতবীর্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার এও একটা ধরন। আব্দুল আজিজের 'হজরৎ আলি ও বীর হমুনান' (১৮৮০) বইটিতে বিখ্যাত মুসলমান সেনাপতি আলির সঙ্গে রামের বানর সেনাপতি হনুমানের পরাজয়ের পর দেখানো হয়েছে রাজা রামচন্দ্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এই ধরনের বিষয় সোনাভানের পুথির মধ্যে থাকাটাও তার জনপ্রিয়তার একটা কারণ। বিষয়টি বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : The Story seems to have been invented with the object of making a Hindu goddes recogise the divinity of Mohomet, and thus effecting the absorpyion of Hindus in the Mahomdanity. Such books are very largiy largeily read by low class Mahmedans in Bengal.

তবে সোনাভানের পুথির জনপ্রিয়তার মূলে একটা বড়ো কারণ নিঃসন্দেহে এর গল্পরস। গল্পরস জমিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে একটি প্রেমকাহিনি; যার একদিকে বীর পালোয়ান মুসলমান যুবক হানিফা আর অন্যদিকে বলশালিনী হিন্দু রমণী সোনাভান। স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে সোনাভানের কথা জানতে পারে হানিফা। তাকে স্বপ্নে দেখে নিজেকে একপ্রকার নিবেদন করে বসে হানিফা। পাগল হয়ে যায় হানিফা সোনাভানের জন্য : কেমনে জাইব আমি টুঙ্গির সহরে।/কোন পথে গেলে পাইব বিবিকে দেখিতে।।" একতরফভাবে সোনাভানকে নিজের স্ত্রীর স্থানে স্থাপন করে ফেলেছে হানিফা। এই প্রেমোপাখ্যানে ভিলেনের ভূমিকা পালন করছে সোনাভানের অমানবিক দৈহিক শক্তি এবং হানিফার প্রতি তার অপ্রেম। কিন্তু হানিফার সোনাভানকে পাওয়ার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় শেষপর্যন্ত সব বাধা কেটে যায়। সোনাভান হানিফাকে স্বামী হিসাবে স্বীকার করে নেয়। এই প্রেমোপাখ্যানের পটভূমি অবশ্য বাংলাদেশ নয়, আরবদেশ। আরব্যকাহিনির আকর্ষণীয় মাদকতা এই আখ্যানে বিভিন্নভাবে মিশে আছে। এই প্রেমকাহিনিতে আমরা পাই নায়ক-নায়িকার মধ্যে ভয়ঙ্কর শক্তিপরীক্ষা। দুজনেই ভয়ানক পালোয়ান। হানিফা সম্বন্ধে বলা হয়েছে : ''বরা জারয়ার মর্দ্দ দুনিয়ার ভিতরে।/লড়িয়া তাহার সঙ্গে কেহ নাই পারে ।" অন্যদিকে সোনাভানের রুদ্রানী মূর্তিটিও ভয়ঙ্কর, কম কিছু নয়। তার বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি। এহেন দুজনের সম্মুখ লড়াইয়ের বর্ণনাটি সাধারণ পাঠক শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় হয় নিঃসন্দেহে। অনেকটা এখনকার 'action' পূর্ণ সিনেমার 'ফাইটিং' এর মতো; কিংবা কুস্তিগীরদের বীভৎস লড়াই যেমন :''হানিফাএ শুনিয়া কথা কাপে থরথর ।/মারিল তামেচা তার মোক্ষের উপর।।/এচা জোরে চর মারে তাহার মোখেতে।/ সামালিতে নারে বিবি গিরে জমিনেতে।।" সোনাভানও কিছু কম যায় না—কমর ''বান্ধিল বিবি মজবুত করিয়া।।/ গর্জিয়া উঠিল জেন শের নর।/গোম্বা দিল হইয়া চলে হানিফা উপর।।/ আসমান জমিন কাপে এচা জোর কার।"

এই শারীরিক লড়াইয়ের 'গৌরচন্দ্রিকা' হিসেবে দুই পালোয়ানের বাগযুদ্ধও আখ্যানে উপভোগ্য হয়ে ওঠে :''সোনাভান বলে নেরে না কর বারাই।/এখনি ধরয়া তরে করিব সাজাই।।/ হানিফা কহেন বিধি না কর গুমান।/এখনি কাটি আমি তোমার গর্দ্দান।।/ সোনাভান বলে আইলে আলি বলবান।/তবু না পারিব মর কাটিতে গর্দান।।/হানিফা কহেন তুই বর বেহাজাব।/শ্বসুরের নাম ধর শুনিতে খারাব।"

সোনাভান-হানিফার এই চাপান-উতোর যেন কবির লড়াই। সাধারণ পাঠক-শ্রোতাকে আকৃষ্ট করার উৎকৃষ্ট কৌশল নিঃসন্দেহে। এ ছাড়া এই গল্পের অলৌকিকতাও জনসাধারণের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। হানিফাকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে সোনাভান। সোনাভান হানিফাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে-'হানিফার গলে ছুরি চাহে চালাইতে'। কিন্তু তীক্ষ্ণ ধার ছুরি দিয়েও সে হানিফার গলা কাটতে পারে না, বরং নিজে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। পুথিকার এর পেছনে আল্লার 'কৃপা'কে দেখিয়েছেন। এ ছাড়া গল্পের শুরুতে হানিফাকে আল্লার স্বপ্নাদেশ, হানিফার রূপ ধরে জিব্রাইলের হানিফার মাকে স্বপ্নে দেখা দেওয়া,

সিন্দুকে ভরে হানিফাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তার বেঁচে থাকা ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলিতে অলৌকিকতার ব্যবহার যথেষ্ট। পাশাপাশি বাস্তবকে চড়া কল্পনার রঙে রাঙানো হয়েছে। তাই সোনাভানের হানিফাকে মদিনা শহরে ছুড়ে ফেলা কিংবা ছ-মাসের পথ ছয় দিনে যাওয়া অসম্ভব হয় না আখ্যানভাগে। দুর্গম পথে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া, ঘোড়ার গলায় সোনার জিন—সবমিলে এক রূপকথা-উপকথার জগতের আভাস স্পষ্ট হয় এখানে।

সোনাভানের জনপ্রিয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ অবশ্যই এর উপস্থাপনভঙ্গি ও ভাষা। কৃত্তিবাসরা যেমন পঞ্চদশ শতকে যুগচাহিদার কথা মাথায় রেখে গুরুগম্ভীর রামায়ণ মহাভারতকে লোকসাধারণের উপযোগী করে পরিবেশন করেছিলেন, এখানেও তার প্রকাশ রয়েছে। কবি এক্ষেত্রে সাধারণ পাঠক-শ্রোতার মধ্যে সোনাভানকে জনপ্রিয় করার জন্য আঙ্গিকগত উপস্থাপনে সহজিয়া ঘরনাকে যতটা সম্ভব কাজে লাগিয়েছেন। ধর্মজিজ্ঞাসু ও গল্পরস পিপাসু শ্রোতৃকুলকে উদ্দেশ্য করে সোনাভান-এর পুথি শুরু হয় এইভাবে :''আল্লা ২ বল ভাই নবি কর সার।/নবির কলেমা পড়ি হইয়া যাবে পার।।/আল্লা ২ বল ভাই জত মমিনগণ।/মোহাম্মদ হানিফার কিছু শোন বিবরণ।।" আখ্যানের বেশিরভাগ অংশে সফলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তানপ্রধান পয়ারবন্ধ। যেমন :''একদিন সোনাভান কহেন উজিরে।/ এচা কেহ পারে জোরে পাছারে আমারে।।" এ পদ্য গদ্যের চেয়েও সাধারণ শ্রোতার কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। কিছুটা অংশে ত্রিপদীবন্ধের ব্যবহার আছে। কিন্তু তার প্রয়োগ অতি সহজ সরল : ''ছএ মাসের মএদানেতে লোগজন নাই সাথে/কমনে জাইব সে শহর।" এই পুথি সাধারণ শ্রোতার কান ও মনকে কীভাবে তুষ্ট করেছিল, তা অনুমান করতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। শব্দ ব্যবহারের মধ্যদিয়েও সাধারণ শ্রোতার আত্মীয়তা অর্জনের নির্ভুল প্রচেষ্টা আছে। যেমন—'হজরত আলির বেটা, রসুলের নাতি', 'আল্লার মেহের আছে হানিফা উপর','কেহ না আটিতে পারে দুনিয়া ভিতর','সোনাভানের দাসি জত রূপের সোন্দরি','সোনাভান বলে নেরে না কর বরাই', 'খানাপিনা খাইয়া মর্দ্দ তৈয়ার হইল', 'সোন হানিফার জঙ্গ হইল খতম' ইত্যাদি। তালিকা দীর্ঘ করা হল না। শুধু শব্দ ব্যবহার নয়, শব্দের উচ্চারণও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবলভাবে লৌকিক। যেমন— জাব (যাব), জমঘরে (যমঘরে), কমর (কোমর), মর (মোর), বিতে (ভিতে), জে (যে), পোছে (পুঁছে), জদি (যদি), ছালাম (সালাম), লোগ (লোক), মুজুরি (মজুরি), কান্দে (কাঁদে), আপছচ (আপশোস), মাঙ্গে (মাগে) ইত্যাদি। এইভাবে আরবদেশের আখ্যান ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমান পাঠক-শ্রোতার হৃদয় হরণ করে। কখনও কখনও ধর্মের বা সম্প্রদায়ের বেড়া ডিঙিয়ে সোনাভানের আখ্যান তথাকথিত হিন্দু পাঠককেও আকৃষ্ট করে। একদিকে সহজ সরল উপস্থাপন, অন্যদিকে গ্রামীণ পুথি পাঠকের সুরেলা কণ্ঠের পাঠ :''আল্লা ২ বল ভাই জত মমিনগণ।/মোহাম্মদ হানিফার কিছু শোন বিবরণ।।/ জতেক পাইল দুক্ষ হানিফা পাহালাবান।/সে সব দুওেক্ষর কথা করিব বএয়ান।।..." শ্রোতামণ্ডলী এর মধ্যে অনুভব করেন মধ্যযুগীয় পাঁচালি কাব্যের প্রতিধ্বনি : ''মহাভারতের কথা অমৃত সমান।/কাশীরাম দাস কহে শুনে পূণ্যবান।" অর্থাৎ নিছক 'উদ্দেশ্যমূলকতা'

নয়, সোনাভানের জনপ্রিয়তার মূলে শ্রোতার মনকে হরণ করার পরম্পরাগত কৌশলটিও কম বেশি দায়ী। অবশ্যই এই শ্রোতা আজকের আধুনিক নাগরিক নন, উনিশ শতকের গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ।

ঋণ স্বীকার

গ্রন্থ ঋণ

১। উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, ওয়াকিল আহমদ
২। সোনাভানের পুথি, ফকির গরীবুল্লাহ
৩। মুসলমানি বাংলা বই (প্রবন্ধ), স্বপন বসু
৪। আমার জীবনী, মীর মশাররফ হোসেন
৫। আমার সংসার জীবন, ইবনে মায়ুদ্দিন আহমেদ

ব্যক্তি

স্বপন বসু, সাইফুল্লা